অন্তিম যাত্রায় ভগ্নাংশ শেষের প্রাপ্তি

আহমাদ ইশতিয়াক

ঐতিহ্য

বড় মামা, আম্মা, আব্বাকে
যারা লেখালেখিসহ সর্বক্ষেত্রেই প্রশ্রয় ও সাহস জুগিয়েছেন

গ ল্প ক্র ম

অনন্ত বহে নিরবধি ৯
ইলিশের ভাগ ২৬
দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে ৩৮
খাদ ৫৩
বৃষ্টিবেলা ৫৯
ভিটে ৬৮
হারানো রাত ৭৮
ভ্রূণ ৯৫
প্রতিঘাত ১০২
পিছুটান ১১৪
অলক্ষের সাধ ১২৯
চন্দ্রগ্রস্ত ১৩৭
যাত্রা ১৪৭
হারানো প্রাপ্তি ১৬১
ভগ্নাংশ ১৭৬
অন্তিম ১৯২

অনন্ত বহে নিরবধি

ভাঙা পুকুর ঘাটটায় শ্যাওলা পড়ে গেছে। অর্ধেক তো দেবে গিয়েছিল গেল বর্ষাতেই। সমস্ত ঘরদোর ভেঙে আসছে। সামনের বর্ষাতে যা আছে তাও বোধহয় মিশে যাবে পুকুরপাড়ের সঙ্গে। সাতসকালে কিংবা মধ্যদুপুরে যখন তখন ইটগুলো খসে খসে পড়ছে। কখন যে কার মাথায় গিয়ে লাগে, আর তক্ষুনি ধরণি নিপাত হয়; কখন কার করোটির ধার ভেঙে খুলির ভিতরে অনুপ্রবেশ করে কে জানে!

এক্ষুনি যেন পাগলা হাওয়ার দম ফিরবে, আর তাতে ওলটপালট হয়ে যাবে সমস্ত ভূলোক।

অবশ্য তাতে দম ফিরে পাবে উঠোনের এককোনে থাকা ক্ষয়িষ্ণু আতাগাছটা। গেল তিন মৌসুমে আতা ধরা তো দূরের কথা ফুলের চিহ্নেরও দেখা মেলেনি। উঠোনে পায়চারি করা রাতা মোরগটা ডানা ঝাপটে ঢালু জায়গাটার ওপরে উঠে এসে তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে। সূর্যপূরী আমগাছটার ছায়া ততক্ষণে সমস্ত পুকুরপাড় আর মাঝ পুকুরের জল অব্দি উজাড় করে দেয়।

সোনালু আর হিজল ফুলের পাপড়িতে ভরে যাওয়া জলের উপরিভাগে হাওয়ায় মৃদু ছন্দপতন হয়। বাণী তখন রসুইঘর থেকে বাসন-কোসন নিয়ে পুকুর ঘাটে ছোটে। ভাঙা পুকুর ঘাটের পাশেই গেল বছরের কার্তিক মাসে ঝড়ে ভেঙে পড়া কাঁঠালগাছটার কাণ্ড দিয়ে হিরণ অস্থায়ী ঘাটটা বানিয়ে দিয়েছিল। পূর্বের ঘাটটির ধ্বংসাবশেষ এখন পাশেই পড়ে আছে।

এখন ওখানটায় দাঁড়ানো তো দূরে থাক উবু হয়ে বসাও যায় না। বাণী বিক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে থালা-বাসনে ছাই লাগায়। তাতে হাতের কনুই অব্দি হাঁড়ির কালি লাগে। অতঃপর তা আঁচলের ধার অব্দি ছড়িয়ে পড়ে। স্থির হয়ে বসতে

গিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে বাণী। আর তখনই জলে ভাসতে শুরু করে মাথায় আঁটানো ঢাকনাসুদ্ধ হাঁড়িটি। বিক্ষিপ্ত হয়ে দুলতে থাকা হাঁড়িটা যেন সাঁতরায়। যতক্ষণে বাণী গুটিয়ে এসে বসে ততক্ষণে বাতাসে সৃষ্ট জলতরঙ্গে হাঁড়িটা পুকুরের গভীরে চলে যায়।

কাঁঠাল ঘাটটার পাশেই গেঁথে রাখা বাঁশের কঞ্চিটা হেঁচকা টানে তুলে নিয়ে জল নাড়ায় বাণী। কঞ্চির অগ্রভাগ হাঁড়ির গায়ে লাগলেও তাতে হাঁড়িটা পেছনে না এসে ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ঠিক তখনই ধপ করে রসুইঘরের ধারের গাছটা থেকে নারিকেল পড়ার শব্দ শোনা যায়। প্রথমেই সে শব্দে চমকে ওঠে বাণী। দ্বিতীয়ত নারিকেল পড়ার শব্দের বদলে বাণীর সমস্ত মনোযোগ এখন হাঁড়ির দিকে। হাঁড়িটা এখন হাত ফসকে জলের মধ্যমণি হয়ে ভাসছে।

উঠোন থেকে মহাদেবের গলা ভেসে আসে, 'মা দেইখে যাও। শিয়লে মোরগ লইয়া পলাইছে! তোমার রাতা মুরগাটা।' এবার যেন রাণীর ব্রহ্মতালু অব্দি সমস্ত ক্রোধ উগড়ে ওঠে। হাতের কাছের বাসন-কোসন, জলে ভাসা হাঁড়ির মায়া আর নারিকেলের আশা সর্বস্ব ছেড়ে সে ছুট লাগায় খোঁয়াড় অব্দি। মহাদেব ততক্ষণে শিয়ালের পেছনে ছুটছে। কিন্তু মোরগ ধরা সেই শিয়াল কি আর ততক্ষণে ত্রিসীমানার মধ্যে আছে! বাতাসের গায়ে ছোটা শেয়ালের ছায়াও ততক্ষণে আর দেখা যায় না।

সব হারানোর শোকে বাণী তখন উঠোনে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তার সাধের তেজি রাতা মোরগটার পালক তখন এখানে সেখানে পড়ে রয়েছে। তার রাগ, হতাশা, ক্রোধ সমস্ত কিছু গলায় জুড়ে বসে। দীর্ঘশ্বাসের গলায় সে বলে ওঠে, 'ও ভগবান, তোর চোখ কি আমায় দেহে না? আমার হইল যত জ্বালা। বেবাকটি কি এমনেই যাইবে!'

মহাদেব অবশ্য এরপর খালি হাতে ফেরে না। শেয়ালের ছায়ার সঙ্গে উথালপাতাল যুদ্ধ করে সে নিয়ে এসেছে শেয়ালের দাঁতাল আর ছিন্ন পায়ে রাতা মোরগটির রানের অর্ধাংশ, মোরগের পেটের বিচ্ছিন্ন আঁতুড়ি, মাথার ওপরে তাজের মতো ঝলসানো খুবলানো বিধ্বস্ত ঝুঁটি।

ছুটন্ত শেয়ালটা হয়তো তখন হোগলার ঝোপে বসে স্বস্তিতে আহারে মত্ত ছিল। বেমওকা হৈ-হৈ রবে এগিয়ে নিরেট বাধা সৃষ্টি করল মহাদেব। খণ্ড-বিখণ্ড ছিন্ন মোরগটার অবশিষ্ট দেহাবশেষ দেখতে পেয়ে বাণীর রাগ যেন আরো চাগাড় দিয়ে ওঠে। তার চোখে ভর করে শ্রাবণের বাদলার মতো বিভ্রান্ত অশ্রু। সমস্ত রাগ গিয়ে আছড়ে পড়ল মহাদেবের ওপর। বিপদ টের পেয়ে মহাদেব মুহূর্তেই হাওয়ার বেগে পালিয়ে যায়।

ফের পুকুরের ঘাটে গিয়ে বাসন-কোসন একাকার করে বসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে বাণী। এগুলো ধোয়া ছাড়া নিস্তার নেই তার। কে কাজ করে দেবে। সব তো চলছে এভাবেই। সূর্যপূরী আমগাছটা জুড়ে সূর্যের কণা লুকোচুরি খায়।

'ও মহাদেব, জলদি আয়। ওয় মহাদেব, জলদি আয় কলাম! শিগগির আয়।' বাণী তারস্বরে ডেকে গেলেও মহাদেবের তখন আর পাত্তা কোথায়! সে ছুটছে তখন মজুমদারদের বাড়ির পানে। রসুই ঘরের ধারের পুঁইয়ের মাচায় বসা দোয়েলটি একনাগাড়ে শিস বাজিয়ে যাচ্ছে। বাণীর ততক্ষণে বাসন-কোসন, সানকি, হাঁড়ি-পাতিল সব ধোয়া শেষ। জলের গায়ে ভাসমান হাঁড়িটা ততক্ষণে অন্য কূলে গিয়ে ঠেকেছে। পাড় দিয়ে হেঁটে গিয়ে ওপারে পৌঁছে জলের মধ্যে হাঁটু ভিজিয়ে হাঁড়িটা তুলে নেয়। তারপর রসুইঘর অব্দি পৌঁছাতেই বাণীর হাঁফ ধরে আসে।

রসুইঘরের বাঁশের মিটসেলফের মাথায় ডেগ আর বাসন-কোসন তোলে বাণী। তাতে শরীর যেন ঢলে আসে।

পুনরায় কাঁঠাল কাণ্ডের ঘাট অব্দি এসে বাকি বাসন-কোসন আর থালাবাটি তুলতে যায় বাণী। এমন সময় ঝকঝকে রোদের মাঝেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে।

'ধুরো, বাদলা নামনের আর সময় পাইল না।'—সামনের ঘর থেকে ভেসে আসে বিধুচরণের গলা। এই ঝুম বৃষ্টিতে বাণী আর কোথায় যায়! মানকচুর গোড়া থেকে ততক্ষণে মানকচুর ডগা তুলে নিয়ে সে মাথায় চাপিয়েছে। বাসন-কোসন তুলতে গিয়ে সে টের পায় বৃষ্টিতে পিঠ অব্দি ভিজে গেছে। মানকচুর ডগা আর কত সামাল দেবে এই জোর বাদলার। বৃষ্টির দিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই বাণী ভিজতে ভিজতে হাঁড়ি-পাতিল বাসন-কোসনসহ ছোটে রসুইঘরের দিকে।

রসুইঘরের দাওয়ায় আসতেই বাদলায় পিচ্ছিল হয়ে যাওয়া জায়গাটিতে আচমকাই পা হড়কায় বাণী। মুহূর্তেই ধরণিতল। সোজা পায়ের গোড়ালিতে এসে ঢোকে বাঁশের কঞ্চিটা। আর সঙ্গে সঙ্গেই অস্ফুট চিৎকার। বিধুচরণ তখন ভিতরের ঘরে বসে উবু হয়ে কাগজপত্র দেখছিল। বাণীর চিৎকারের সঙ্গে চমকে উঠে ধেয়ে আসে সে। ততক্ষণে মহাদেব বাণীর হাত ধরে তুলতে লাগছিল। ঝুম বৃষ্টিতে মহাদেবও ভিজে একাকার। বাণীর তখন আর কিছু বলার শক্তি নেই। মহাদেব সেই শক্তপোক্ত শরীর তুলতে গিয়ে পুনরায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

গায়ে কাদা লেগে একাকার, তা দেখে বিধুচরণ হাসবে নাকি কাঁদবে ভুলে যায়। বাণীর হাত ধরে প্রথমে সে ওঠানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। এরপর আবার তুলতে গেলে বাণী এবার অসুরের গলায় চেঁচিয়ে উঠে বলে, 'ধরন লাগব না, এতক্ষণ বাদে আইলো সোহাগ দেখানোর লাইগা! বিধুচরণ তাতে দমে না গিয়ে পূর্ণশক্তিতে নিজের সমস্ত বল হাতে তুলে এনে উঠিয়ে ধরে থলথলে শরীরটা। আর তখনই ফের তৃতীয়বারের মতো পায়ের ব্যথায় কাতর হয়ে চেঁচায় বাণী।

বিধুচরণ তখন 'দেখি দেখি' বলে দেখে, পায়ের তালুর অগ্রভাগে হুলের মতো ফুটে আছে বাঁশের ত্রিকোণ কঞ্চিটা।

'এই ক্যামনে বের করমু, এত ফোঁড়ার মতো ভিতরে ঢুকল!' বিধুচরণ কঞ্চি সমেত পা টেনে ধরে পরখ করে বলে। বেঘোরে কাটা পড়ার মতো কঞ্চিটা তখন চেখে আছে। বিধুচরণের কাঁধে হাত চেপে দাওয়ায় উঠে আসে বাণী। মহাদেবকে বলে কয়ে একঘটি জল গরম করে তুলে নিয়েছে বিধুচরণ। কী করবে সে জানে পুরোপুরি।

অতঃপর কোনো প্রকার অপেক্ষা আর উপশমের প্রতীক্ষায় না থেকে কোনোরূপ যন্ত্রণার উপদ্রবের কথা না ভেবে দাওয়ায় তোলা সকালে নারিকেল মালায় বেটে রাখা হলুদ টেনে নিয়ে কুসুম জলের সাহায্য ছাড়াই হেঁচকা টানে বাণীর পায়ের তলা হতে খাঁজের মতো কঞ্চিটা এক টানে তুলে আনে বিধুচরণ। আর তখনই বাণীর অস্ফুট চিৎকারে যেন প্রবল বৃষ্টির শব্দও থেমে যায়। বিধুচরণ 'দেহি দেহি' বলতেই ব্যথায় সজোরে লাথি কষায় বাণী। আর তা বিধুচরণের অণ্ডকোষে লাগে, নাকি লিঙ্গ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় তা দেখার কী আছে।

তাতেও কর্তব্যবোধ হতে বিন্দুমাত্র পিছপা হয় না বিধুচরণ। মহাদেবকে বলে রিফিউজি লতার ঝোপ তুলে আনে বিধুচরণ। অতঃপর বাণীর পা-টা তুলে নিয়ে কোলের ওপর রাখে। এরপর রিফিউজি লতা হাতের তালুতে নিয়ে ঘসে। প্রথমে বাটা হলুদ লাগিয়ে, অতঃপর রিফিউজি লতার রস ডলে, ঠেসে ধরে তাতে গোটা গামছা সমেত গিট্টু টান টান করে মোড়ায়।

বাণীর মোচড়ামুচড়িতেও বিন্দুমাত্র কাজ হয় না। যন্ত্রণায় বিদ্ধ পায়ে সূক্ষ্ম হাতেই মানকচুর রস লাগায় বিধুচরণ। একপর্যায়ে কাটা মোরগের মতো তড়পাতে তড়পাতে থেমে যায় বাণীর সমস্ত আস্ফালন। বৃষ্টির জলে আর বাণীর রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে উঠোনের কোণ।

সারা দুপুর গড়িয়ে বিকেল নাগাদ চোখ মেলে বাণী। শিয়রে তখন হারু ডাক্তার। অনন্ত কবিরাজকে ডাকতে গিয়েও পায়নি বিধুচরণ। দিন তিনেক

আগে বাক্স-পেটরা গুছিয়ে অনন্ত কবিরাজেরা নাকি চলে গেছে ওপারে। বাড়ি ভরতি লোকে চিরকাল পরিপূর্ণ অনন্ত কবিরাজের ভিটে দিন তিনেকের ব্যবধানে এখন খাঁ-খাঁ করছে। তুলসী তলা অব্দি তুলে নিয়ে গেছে তারা। এখন কেবল উঠোনে পিঠ টান করে শুয়ে আছে কুকুর দুটো।

হারু ডাক্তার এসেই প্রথমে কিছুক্ষণ চেঁচায়। সেই বাদলার মধ্যেই তার টোল পড়া চেম্বারে না নিয়ে যাওয়ার জন্য কতক্ষণ খিস্তি আওড়ায়। তারপর মার্কিন কাপড়ের ব্যান্ডেজ দিয়ে বাণীর গোটা পা মুড়িয়ে দেয়। অতঃপর দেড় টাকা ফি নিয়ে আর দেরি না করেই সে বেরিয়ে পড়ে। কারণ ফেরার পথে এই ঘুটঘুটে আঁধার রাতের মধ্যেই মুখার্জি বাড়ি হয়ে রোগী দেখে যেতে হবে তাকে। বীরেন মুখার্জির অবশ্য বাঁচার আশা নেই। বয়স নব্বইয়ের কোটা পেরিয়েছে আরো কয়েক বছর আগেই। বুড়োর এই অবস্থাতেই যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছে তার ছেলেপুলে আর নাতিরা। পারলে এখনই যেন বুড়োকে চিতায় তুলে দিলেই তারা বাঁচে। তাদের গলায় বুড়ো যেন মাছের কাঁটা।

হারু ডাক্তারকে রাতে খেয়ে যেতে বলে বিধুচরণ। কিন্তু নুনে ভাতে আর মাগুর মাছের ঝোল ছাড়া আজ অন্য কোনো সালুন নেই। সকালের দুধ অবশ্য আছে খানিকটা। কিন্তু হারু ডাক্তার খাওয়ার অপেক্ষায় নেই বলে উঠে পড়ে। ঝোলানো হারিকেনটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বিধুচরণ।

সামনের ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে হারু ডাক্তার উঠোনে ডালিম গাছের তলে উপুড় করে সাইকেলটা উঠিয়ে তাতে উঠে পড়ে। অতঃপর বিধুচরণের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বীরেন কাকার অবস্থা কিন্তু খারাপ। রাইতভর টিকব নাকি ঠিক নাই। ওগো বাড়িত যামু অহন; কাইল বিকেলে বাণীরে আইসা একবার দেইখা যামু নে।'

হারু ডাক্তার চলে যাওয়ার পথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে বিধুচরণ। তারপর ঘুটঘুটে অন্ধকারের মাঝে হারিকেনটা সঙ্গে নিয়ে চারদিকে চোখ বুলায়। এরপর বিধুচরন হাঁটে। বাঁশঝাড়ের দিকে এগোতেই কী অদ্ভুত এক হাওয়ায় মুহূর্তেই তার দেহ-মন মাতাল হয়ে আসে। জ্বলন্ত হারিকেনের চিমনির বহির্ভাগে বাতাসের ঢেউয়ে হারিকেনের আগুন যেন নিভে আসে। বাতাস সরে যেতেই তা আবার ফিরে আসে।

ওপাশের তুলাগাছটার নিচে মাকে কত বছর আগে যে দাহ করা হয়েছিল। মা'র মুখাগ্নি করেছিল বড়দা। বড়দা বেঁচে থাকলে হয়তো শেষমেশ ঠিকই থাকত তারা। অবশ্য বড়দা না থাকায় সুরেশদের বেশ সুবিধাই হলো। তাদের কোনো আর পিছুটান থাকেনি। মেজদা তো বাবা থাকতেই ওপারে

চলে গেল। যাওয়ার সময় বাবাকে যখন বলতে গেল, তখন বাবার জমাটবাঁধা সমস্ত রাগ দুচোখে এসে জমল। বাবা কেবল বললো, 'পূর্বপুরুষের ভিটে ছাড়তে একটাবারের জন্যও তোর মায়া লাগল নারে যতীন?'

মেজদা গিয়েছিল চুয়াল্লিশের শুরুতে। সুরেশরা গেল পঞ্চাশ কি একান্নতে। সুরেশরা গিয়েছিল অবশ্য খুলনার কালশিরা দাঙ্গার মাস দুয়েক পরে। আর এখন চলছে আটান্ন। বাবা যতই গালি দিয়েছিল মেজদাকে, এখনকার অবস্থা আর পরিস্থিতি দেখলে হয়তো নিজের গায়েই সমস্ত রাগ তুলে নিত। মেজদাই সবচেয়ে ভাগ্যবান ছিল। কারণ মেজদা যখন গেল, তখন জমি জিরেত, টাকা পয়সা, ঘর-গোয়াল সবই পেল। অথচ সুরেশরা এখনো পুরোপুরি উঠে দাঁড়াতে পারেনি।

তুলাগাছটা থেকে কহাত দূরেই বিশাল আমগাছটা ছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর ওই আমগাছটাই কেটেছিল বিধুচরণ। জায়গাটা এখন আর আগের মতো ফাঁকা নেই। বনতুলসীর ঝাঁপ মিলেছে ওখানটায়। ওরা চলে যাওয়ার পর আর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না এই মাটিতে।

মা-বাবা, ঠাকুরদা সব এই মাটিতেই মিশে আছে। মরার আগে বাবার পরম আকুতিটা দুচোখে আজও ভাসে বিধুচরণের। 'যদু, মধু, বিধু আর যাই করিস, সাত পুরুষের মাটি ছাইড়ে কোথাও যাসনে বাপ! কারো হাতে আমার বাপ ঠাকুরদার সাধের ভিটাখান তুইলে দেওয়ার আগে তোগো মরণ যেন এই ভিটাতই হয়!' সে কথা কেবল বড়দা-ই বক্ষে ধারণ করছিল।

দেশের এখন যে পরিস্থিতি তাতে ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা-ই এখন নিত্য ত্রস্ত করে রাখে বিধুচরণকে। শেষমেশ এই মাটি বুঝি আর কপালে জুটবে না।

ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যেই হারিকেন নিয়ে সাঁতলা পড়া ঘাট অব্দি যায় বিধুচরণ। হারিকেনটা সূর্যপূরী আম গাছের ভেঙে যাওয়া ডালে ঝুলিয়ে সন্তর্পণে কাঁপা কাঁপা পায়ে হাত মুখ ধুয়ে নেয় সে। হারিকেনের সলতে শেষ হয়ে আসছে। ঘরের দাওয়া থেকে হঠাৎই মহাদেবের 'বাবা, বাবা' শব্দ ভেসে আসে। হারিকেনটা তুলে পা টিপে টিপে উঠোন পেরিয়ে ঘরের দুয়ারে এসে দাঁড়ায় বিধুচরণ। তারপর শান্ত পায়ে ঘরের কাছে এসেই মহাদেবকে ডাকে সে। কিন্তু মহাদেবের কোনো সাড়া শব্দ নেই। বাণী তখনও বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। বাণীর পাশেই বসে বসে ঝিমুচ্ছে মহাদেব। তবে 'বাবা বাবা' শব্দে কে ডেকে উঠল! মহাদেবের এই ঝিমুনি অবস্থায় তো ডাকার কথা না। বিধুচরণ চোখে জুড়ে এক রহস্যময় বার্তা ছেয়ে যায়।

অবশেষে সাত দিন পেরিয়ে গেলেও বাণী সেরে ওঠেনি। বাণীর পুরোপুরি সেরে উঠতে মোটেমিলে এগারো দিন লাগে। কিন্তু বাণীর মাথায় তখনও ফের ঘুরছে ওপারের চিন্তা। পশ্চিমের শিমুলতলার জমি আর আর পুকুরের উত্তরের ধানী জমিটায় এবার আবাদ ভালো হয়নি বিধুচরণের। অতি গরমে এবার বেশিরভাগ ধানই হয়েছে চিটা। তবে রূপচাঁদের পাশের জমিটাতে এবার মকাইয়ের আবাদ করে বেশ ভালোই করেছে সে। ভূপেনের জমিতেও কাউনের ফলন বেশ হয়েছে। খরায় এবার ধানের আবাদ সবদিকেই খারাপ।

আকালের দিন বুঝি আবার দাপিয়ে এল। অবশ্য এসব নিয়ে বাণীর আর কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। তার মনোজগৎ জুড়ে এখন কেবল ওপারের কেচ্ছা কাহিনি। ওপারে যাওয়ার পর সে কী কী করবে; সকাল সন্ধ্যা মহাদেবকে বসে বসে সেসবই শোনায়। বাণীর দুচোখে কেবলই ওপারে যাওয়ার স্বপ্ন। একটা ভিটে, সঙ্গে উঠোন আর বাড়ির পেছনে পুকুর, পুকুর লাগোয়া গোয়ালঘর আর রসুইঘর বেয়ে ওঠা পুঁই মাচা। এসবই গেঁথে আছে বাণীর দুচোখ জুড়ে।

রোজ দুপুরে আর রাতে খাটে শুয়ে চোখের পাতা নেমে আসার আগে বাণী বিধুচরণকে ওপারে যাওয়ার কথা দুবার করে স্মরণ করিয়ে দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত রসুইঘরে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার দৃষ্টি যেন ওপারেই থাকে। যে করেই হোক তাকে ওপারে যেতেই হবে এই হলো তার একান্ত লক্ষ্য।

সাতসকালেই কাগজপত্র নিয়ে মহকুমা সদরে গিয়েছিল বিধুচরণ। এখন সব জমি নিয়ে যত তোড়জোড়। সমস্ত হিন্দুরা ওপারে পৌঁছাতেই পারলেই যেন বাঁচে। ওপাশ থেকে মুসলমানেরাও দেদারসে এপারে ঢুকছে। পৌষখালী, মনোহরপুর আর কুতুবপুরে মুসলিম লীগের চ্যাংড়াদের হাতে হিন্দু বাড়িতে আগুন দেওয়ার পরে ওপারে চলে যাওয়ার জন্য হিন্দুরা সব মুখিয়ে আছে। আর তাই তহসিল অফিসেও বেজায় ভিড় থাকবে ভেবে সাতসকালেই রওয়ানা দিয়েছিল বিধুচরণ। প্রথম প্রহর বলে ভিড়টাও ছিল অনেকটা কম। বেলা বারোটার আগেই কাজ শেষ করে বাড়ির পথ ধরল বিধুচরণ। যতক্ষণে গয়েশপুর হাটের কাছে এসে সে ভিড়ল ততক্ষণে সূর্যটা পশ্চিমে ঠিক কপাল বরাবর এসে ঠেকেছে।

একে তো ক্লান্তি দ্বিতীয়ত পিপাসা। তৃতীয়ত সেই সাতসকালে কটা পান্তা খেয়ে বেরিয়েছিল বিধুচরণ, সেই পান্তা এতক্ষণে কোন গহ্বরে এসে পৌঁছেছে আর হাওয়ায় মিলে গিয়েছে কে জানে। গেল কয়েকদিনে গরমের মাত্রাও অনেকখানি বেড়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের খরতাপ বলে কথা। বাড়ি পৌঁছে চারটা

খেয়েদেয়ে সে যে ঘুমাবে তারও উপায় নেই। তুলা গাছতলায় সবসময় কোনো না কোনো গরুর গাড়ি পাওয়া যায়। অথচ আজ যেন তার নিশানাও নেই।

পিপাসায় গঙ্গাচরণের টোলের ধারে চলে আসে বিধুচরণ। কুয়ার জল একদম তলা অব্দি নেমে গেছে। দড়ি বেঁধেও এই জল তোলার উপায় নেই। পিপাসায় তাই হাঁসফাঁস করে সে। গঙ্গাচরণের দোকানের কপাট নামানো। এই ভরদুপুরে পুরো বাজারে একটা দোকানও খোলা নেই। গরুর গাড়িরও দেখা নেই। জিরিয়ে না নিয়ে ফের সোজা হাঁটতে থাকে বিধুচরণ।

গগণদের বাড়ির সম্মুখভাগে পৌঁছানোর পরই চলার গতি স্তম্ভিত হয়ে আসে বিধুচরণের। জলপানের নিমিত্তে চৌধুরী বাড়ির সামনে গিয়ে গগণ গগণ বলে কয়েকবার ডাকে বিধুচরণ। না কোনো সাড়াশব্দ নেই! বাড়ির সম্মুখ দালানের সামনে পিটপিট করে শুয়ে আছে কুকুর দুটো। পিটপিট করে তাকিয়ে বুঝে নিচ্ছিল আগন্তুকের পরিচয়। বিধুচরণের 'গগণ গগণ' ডাকে কুকুরগুলো সমস্বরে ডেকে ওঠে। বিধুচরণ ফের ডাকে।

কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে চরণ চরণ বলেও দু-দফা ডাকে। বাড়িতে কেউ নেই নাকি! এরা সব গেল কোথায়! বিধুচরণের এদিকে তেমন একটা আসা হয় না। কেবল মহকুমা সদরে যেতে হলেই এই পথটা ধরতে হবে। নয়তো গঙ্গারামপুর স্টেশন থেকে ট্রেনে। বাড়ির সব গেল কোথায়, ভাবতে ভাবতে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে বিধুচরণ। বাড়ির মূল ভবনের দুয়ারে তালা ঝুলছে।

উঠোনটাও পুরো শূন্য। রসুইঘরের দাওয়ায় সজনেগাছটার তলে গগণদের কুকুরটা ঝিমাচ্ছে। রসুইঘরেও তালা ঝুলছে। উঠোনের শেষ কোণের নিমগাছ আর বাঁশঝাড়টা পেরিয়ে ঠাকুরঘরের দিকে এগোয় বিধুচরণ। না, ঠাকুরঘরেও তালা ঝুলছে। এরা সব গেল কোথায়! বেড়াতে গেলে বুঝি সব একসঙ্গে যায়। আগে এমনটা দেখেনি বিধুচরণ। বাড়িতে কাউকে না দেখে তৃষ্ণার কথা পুরোপুরিই ভুলে যায় বিধুচরণ। অশ্বত্থ তলার ঠাকুরঘরের ভিতরের কালীমূর্তিটা কি বিক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে?

সম্মুখে যত্রতত্র মোম, তুলসী মালা, বেলপাতা, জবা আর বিবর্ণ দূর্বা ছড়িয়ে আছে। বাইরে থেকে তালা ঝোলানো দেখে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে কালীর দিকে প্রণাম করে বিধুচরণ। কেউ বাড়িতে না থাকায় বাড়িটা কেমন যেন রহস্যময় লাগে। বিধুচরণ কাউকে দেখতে না পেয়ে বরং বাড়ির মেয়েদের পুকুরপাড়ের দিকে যায়। সুপারি ও জামগাছের সঙ্গে বাঁশ টাঙিয়ে তাতে সুপারির খোল টানিয়ে বেড়া টানানো। পুকুরপাড়ের ধারের টগর এবং

জোড়া জবাগাছটা ফুলে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। বিধুচরণ দেখল সদর দরজার সামনে পা বিছিয়ে শুয়ে থাকা কুকুর জোড়ার একটি এগিয়ে আসছে। এরপর দু-পা আগের মতো বিছিয়ে কপালটা মাটিয়ে ঠেকিয়ে ঠাকুরঘরের সামনে এসে শুয়ে যায়।

সারা বাড়িটা কেমন নিষ্প্রাণ হয়ে আছে। মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ম্লান করে দিচ্ছে ঘুঘু আর ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। পুরো বাড়ি খালি করে বুঝি তারা বেড়াতে গেল! বাড়ি জুড়ে গাছে পরিপূর্ণ হওয়ায় ছায়া থাকা সত্ত্বেও বিধুচরণের পূর্ববর্তী তৃষ্ণাটি জানান দেয়। বিধুচরণ উঠোনের এককোণে তুলসীতলার ধারে ফিরে আসে। কুয়াতলায় এসে বিধুচরণ দেখে কুয়ার জল বেশ নিচে নেমে গেছে। যদিও জলের স্তর দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু এই জল তুলবে কী করে বিধুচরণ। পাশে এক মাটির ঘটি বাদে আর কিছুই নেই। ঘটি আর কতখানি পৌঁছাবে। হাত নিচে নামালেও ঘটি দিয়ে জল ছোঁয়ানো সম্ভব নয়। দড়ি থাকলে হতো।

ঘটির মুখোয় দড়ি পেঁচিয়ে নিচে ফেলা যেত। কিন্তু আশপাশে খুঁজেও দড়ির খোঁজ পায় না বিধুচরণ। জল পানে ব্যর্থ হয়ে বিধুচরণ ভাবে পুরো বাড়িতে একটা লোকও বুঝি নেই! ফের পুকুরপাড়ে ফিরে যায় বিধুচরণ। আঁজলা ভরে জল খায়। তীব্র গরম আর ভ্রমণক্লান্তিতে ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল। দশ বারো দফা আঁজলা ভরে জল খেলেও তার তেষ্টা মেটে না।

এমন সময় কার যেন পায়ের শব্দ পায় বিধুচরণ। ঘাট থেকে উঠতেই দেখে চৌধুরী বাড়ির পুরোহিত কৃষ্ণপদ ঠাকুরঘরের তালা খুলছে। বিধুচরণকে দেখতে পায়নি সে। বিধুচরণ ঘটিসমেত উঠোনে ফিরে আসে। তাতেও যেন কৃষ্ণপদ টের পায় না। বিধুচরণ 'ও ঠাকুরমশাই' বলতেই কৃষ্ণপদ পেছনে তাকিয়ে বলে, 'আপনে আবার কই থেইকা! মেলাদিন পরে দেখলাম। কই গেছিলেন?'

'তহসিল অফিসের কামে মহকুমা সদরে গেলাম। আইতে আইতে এই অবস্থা। যা গরম। বাড়ির লোকজন সব কই?' কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলে বিধুচরণ।

'কি কন! ক্যান আপনে জানেন না হেরা তো গেল হপ্তায় সব ইন্ডিয়া গেল!' কোনো দুনিয়াই থাকেন আপনে।' কিছুটা বিরক্তির সঙ্গেই বলেই কৃষ্ণপদ। আগে হলে স্তম্ভিত হয়ে যেত বিধুচরণ। কিন্তু এখন সব স্বাভাবিক।

কিন্তু চৌধুরী বাড়ির সব ইন্ডিয়া চলে গেছে এটা কেমন যেন অসম্ভব মনে হয় বিধুচরনের। 'কী কন হেরা ইন্ডিয়া গেল। কিছুই তো জানবার পারলাম না।' বিস্ময়টা গোপন করার চেষ্টা করেও গোপন করতে পারে না বিধুচরণ।

চৌধুরীদের মতো লোকেরা ইন্ডিয়া চলে যাবে এত রীতিমতো অসম্ভব। গগণ, চরণ হরিষরা ইন্ডিয়া চলে গেছে আর সে জানে না বিষয়টি বিধুচরণের অতি আশ্চর্যের মনে হয়। কৃষ্ণপদ প্রথমে বিরক্তি প্রকাশ করলেও সহসাই বুঝতে পারে হরিপদের সব কিছুই অজানা।

তাই ঠাকুরঘর ও সম্মুখভাগ ঝাড়ু দিতে গিয়ে তার গলায় গৃহকর্তার প্রতি তীব্র মায়া আর অনুরাগ ভেঙে আসে। 'কী আর কমু কন। গেল হপ্তাহে তো চৌধুরীরা সব চইলা গেল। পুরা বাড়ি খাঁ খাঁ করতাছে। আমিও চইলা যামু ধরছি দুই সপ্তাহ বাদে।'

গগণরা তথা চৌধুরীরা এ তল্লাটে তো বটেই, আশপাশের বেশ কয়েকটি তল্লাটের মধ্যেও সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল। সেই চৌধুরীরা চলে গেছে এটা অকল্পনীয় মনে হয়। যেভাবে মানুষ ছুটছে সেভাবে কজন হিন্দুই বা শেষমেশ থাকে তা দেখার বিষয়। বাণীর কানে এখনো এই খবর পৌঁছেনি। এমনিতেই ওপারে যাওয়ার জন্য ওর যে তোড়জোড় তা আরো কয়েকগুণ বাড়বে নিশ্চিত।

'আপনেরে এখনো গেলেন না যে?' কৃষ্ণপদ নিজেই সামনের উঠোনটা সাফ করতে করতে বলে। 'আইজ হোক আর কাইল হোক। যামু তো নিশ্চিত। সামনের হপ্তায় দেখবার আসব। এপারে আর কে থাকব! আইজ নয়তো কাইল সবই তো চইলা যাইব গা।' হতাশার গলায় বলে বিধুচরণ।

'কী বাড়ি কী অইয়া গেল। এই বাড়ি আর কদিন বাদেই তো মোসলমানের হাতে যাইব। ঠাকুরঘর আর ঠাকুরঘর থাকব না। ওইহানে দেখবেন হয়তো নামাজঘর অইবো। তুলসীতলাও কি আর রাখব।

কর্তাবাবুরা যাওনের সময় সব নিল। কইল আবার আসব। কে আর আসব! হ্যারা তো সবটি লইয়াই গেল। তয় আমি কিন্তু কালীরে ছাড়ুম না। যাওনের সময় লইয়া যামু।' কৃষ্ণপদ একনাগাড়ে বলে যায়। বিকেল শেষ হয়ে আসছে। দড়িতে বাঁধা পিতলের কলসি কুয়ায় ফেলে কৃষ্ণপদ। জল ভরাট হয়ে গেলে দড়ি টেনে তুলেও আনে।

'বিনিময় কোন জায়গায় হইল কিছু জানলেন নাকি ঠাকুরমশাই?' বিধুচরণ আয়েশি গলায় বলে। 'কই আর ওই চন্দ্ররামপুর। গেলবার তপন কর্তারা যে জায়গায় গেল। তয় যে মোসলমানের লগে বদল অইল ওই তুলনায় কিছুই পাইল না। আগে যারা গ্যাছে হেরগো একখান গতি অইছে। কিন্তু আবার আর গতি নাই। তয় মোসলমানের লাভ।'

ওই পারে কিছুই নাই দেখেন গিয়া এই পাশে বদল কইরে কামের কাম করি দিল। হিদুর কোনো জায়গায় লাভ নাই। এইপারে ছিল ভালা। কিন্তু

থাকার আর জায়গা কই! হিদুর চিরকালই দুর্গতি।' ততক্ষণে পূজার সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করে নিয়েছে পুরোহিত কৃষ্ণপদ। আক্ষেপ করতে করতে বাড়ির পথ ধরে বিধুচরণ।

সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে বিধুচরণের বাড়ি বিনিময়ের অনেকটা বায়না হয়ে যায়। ভাদ্র মাসেই ওরা এপারে চলে আসবে। আর বিধুচরণরা ওপারে চলে যাবে। মদন খুড়োই সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। অবশ্য তাতে তার ভাগ্যেও চল্লিশ টাকার মতো গেছে। ওপাশ থেকেও খুড়োও খেয়েছে নিশ্চিত।

খুড়োর সঙ্গে মুসলিম লীগের পাণ্ডাদের বেশ দহরম মহরম সম্পর্ক। একসময় কংগ্রেসের ঝান্ডা ধরা খুড়ো এখন মুসলিম লীগের পাঁড় দালাল হয়েছে। সময়ের সঙ্গে একি বিবর্তন, ভাবলেই বিস্মিত হতে হয়। মদন খুড়ো যতটা ভাবছে ততটা কিন্তু নয়। তাকেও শেষমেশ যেতে হবে। দিনের মধ্যে মুসলিম লীগের পাণ্ডারা যতটা পারছে উসুল করে তুলছে। কিন্তু শেষমেশ মদন খুড়ো থাকতে পারবে কিনা সেটাই দেখার বিষয়। যতই দহরম মহরম সম্পর্ক থাকুক না কেন দিনশেষে সে তো হিন্দুই।

এরই মধ্যে বাণী আর হিরণকে নিয়ে রঘুনাথপুরের জায়গাটিও দেখে এসেছে বিধুচরণ। জায়গাটা বাণীরও বেশ পছন্দ হয়। তবে পছন্দ না হয়েও উপায় নেই। এখন যেভাবেই হোক ওপারে চলে যেতে পারলেই চলে। আস্তে ধীরে না হয় গুছিয়ে নেওয়া যাবে। সকাল বিকাল বাণীর ঘ্যানর-ঘ্যানর আর রাত দুপুরের স্বপ্নের কথা শুনতে কার না ভালো ঠেকে!

মিয়াদের বাড়িটা অবশ্য মন্দ নয়। দোচালা টিনের দেহাতি বাড়ি। পাশেই পুকুর, দুপাশে এক চিলতে করে ক্ষেত। একাংশে সুপারি বাগানের সঙ্গে পেছনে বাঁশঝাড়। কুয়াও আছে একটি। জায়গা জমি বিধুচরণের তুলনায় অবশ্য কম। আর এখানকার মতো ওখানে এত জনবসতি নেই, মানুষজন কম। তবে পাশেই আরেক হিন্দু পরিবার নতুন করে ঘর তুলেছে। পথ দিয়ে হেঁটে গেলে মাঝে মাঝে একটা দুটো বাড়ি পড়ে। তবে মাইল দেড়েক দূরে জনা নন্দেখালী হাট আছে। সপ্তাহে রোববারে আর বুধবারে হাট বসে। তবে নিত্যদিন সকাল বিকেল আনাজপাতি মসলা পাওয়া যায়। আরো চার ক্রোশ গেলে মিঠেখালী স্টেশন এবং নদী লাগোয়া গঞ্জ।

নতুন ভিটে, নতুন দেশের নতুন স্বপ্নে বাণীর সমস্ত মনোজগৎ আজকাল পালটে গেছে। সকাল-বিকেল ঘরদোর সাফ, রান্নাবান্না, গরু, হাঁস, মুরগির দেখভালের পাশাপাশি যখনই সামান্য অবসর মেলে তখনই সে বাপ-ন্যাওটা মেয়ের মতো বিধুচরণের পাশে এসে ঘুরঘুর করে। অতঃপর আয়েশি গলায় কখনো সখনো বলে বসে 'মিয়াজীরা কী কইল? ওই বাড়ির পাশের লোকের

সঙ্গে আমি কিন্তুক কথা কয়া আসছি। হ্যারা যাওনের সময়ে পান নিবার পারে নাই। যাওনের সময় পান নেওনের কথা কয়ো তো একবার। আরেকটা কথা ওপারে যাইয়াই কিন্তু আমি প্রথমে হিরণের বিয়া দিমু। লাল শাড়ি পইরা হিরণের বউ আনমু।'

বিধুচরণের এখন অখণ্ড অবসর। এবার আবাদটাও করেনি সে। ওপারে গিয়ে না হয় ফের আবাদ শুরু করা যাবে। ঘরে যা মজুদ আছে তাতে আরো মাস পৌনে দুই চলে যাবে। ততদিনে ওপারে গিয়ে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর হিরণ তো রায়দের কাছ থেকে কিছু টাকা এরই মধ্যে পেয়েছে। কাজ ছাড়ার সময় মুন্সিদের কাছ থেকেও কিছু টাকা পেতে পারে। ওপারে গিয়ে রায়দের কাজে যদি আবার লেগে থাকতে পারে তাহলে তো একটা গতি হয়েই গেল। অবশ্য রায়দের এখানে যে প্রতিপত্তি ছিল ওপারে গিয়ে আর কতখানি থাকে সেটাই ভাবনার বিষয়। দলিল কাগজের হিসেব নিকেশের ফেরে এপারের কত রায় বাহাদুর যে ওপাশে গিয়ে যে ভিখারি হয়ে গেছে সে হিসেবও পাওয়া গেছে।

বিধুচরণ ক্যাম্বিসের স্যুটকেসটা ধুয়ে উঠোনে মেলে দেয়। ট্রাংক জোড়া সাফ সুরত করে। 'শুনো আমি কিন্তু সুপারির ধারে কয়েকটা পানগাছ লাগাইয়া দিমু। যা দাম ওই পারে পানের।' বিধুচরণ কেবল শুনে যায় আর মাঝে মাঝে সম্মতিসূচক 'হ্যাঁ হু' করে। 'পুকুরের চাইর পাশে কিন্তু সজনে, নিম আর হরীতকীগাছ লাগাইবা। ওপারে গেলে প্রথম কদিন আমি কিন্তু বিরাম করমু। হিরণের কিন্তু এখনো আওয়ার নাম নাই। তুমি একবার যাইয়া আনবা নাকি?' বাণীর বকর বকরে বিধুচরণ বলে, 'এখন গিয়ে লাভ কী। ওর তো আরো কয়েকদিন লাগব। কেবল রায় বাড়ির লোকজন গেছে। ওপাশ থেইকা তো মুন্সিরা আইল। ওরে তো এমনেও রাখব না। আগে তোওর কাছ থেইকা সব বুইঝা নিতে অইব।' বিধুচরণ জানে মুন্সিদের খেয়াল-খুশিমতো কটা দিন চললেই বাড়তি কিছু টাকা আসবে, তাতে আর মন্দ কী!

বাইরের বৃষ্টিটা এখনই নামবে, নাকি আজ গোটা দিনে বৃষ্টিই হবে না, তা এখন আর অনুমান করা যায় না। গত তিন দিন ধরে এমনই রোদ-মেঘের লুকোচুরি চলছে।

একবার আকাশ ঘন করে মেঘ আসে তো পরক্ষণেই মেঘ ঠেলে সূর্য নিজের অস্তিত্ব জানান দেয়। চক্রাখালী যেতে হবে বিধুচরণকে। মেঘ-রোদের এই দোলাচলে গোলাঘর থেকে ছাতাটা নিয়ে বিধুচরণ যখন বের হবে ঠিক তখনই বাড়ির বাইরে হিরণের গলা শোনা যায়। চলে এসেছে সে তবে। বিধুচরণ ছাতাটা গুটিয়ে নেয়। আরেকটু পরেই না হয় বের হবে সে।